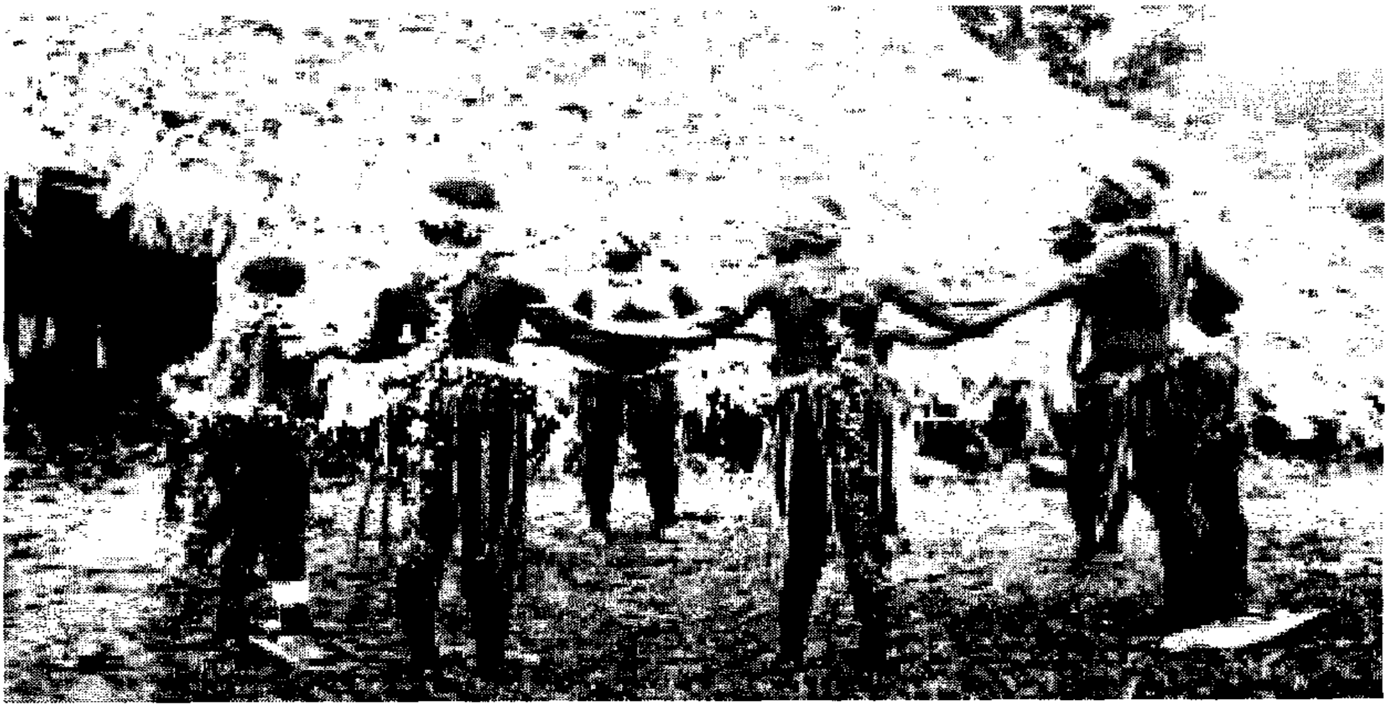

জীবন যেরকম । ছবি : এ এন এস আই-এর সৌজন্যে

জারোয়াদের কথা

জয়ন্ত সরকার
(প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধিকারি, ভারতীয় মানব বিজ্ঞান সর্বেক্ষণ)

আন্দামান নামটির আমবাঙালির কাছে একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বেশির ভাগ বাঙালির কাছে বঙ্গোপসাগরে কোলকাতা থেকে ১২৫৫ কিঃমিঃ দক্ষিণপূর্বে কালাপানির মাঝে এই ভয়ঙ্কর দ্বীপ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাবজ্জীবন কারাবাসের স্থান। এর কুখ্যাত 'সেলুলর জেল' স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর ব্রিটিশ শাসকদের অকথ্য অত্যাচারের ঐতিহাসিক স্থাপত্য।

আরো একটা ধারণা এক দশক আগেও বহুল প্রচলিত ছিল। আন্দামানের বনজঙ্গলে যে আদিবাসীরা থাকেন, তাঁরা অতি হিংস্র, বাইরের মানুষ দেখলেই জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তাঁদের বিষ মাখানো ভয়ঙ্কর তীর, যার আঘাত মানে অব্যর্থ মৃত্যু!

বস্তুত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আন্দামানে পাঠানোর অনেক আগেই ১৮৫৮ সাল থেকে বর্তমান মাইনমারের পেনাং এবং ভারতের মুল ভুখণ্ডের বিভিন্ন জেল থেকে কুখ্যাত সব যাবজ্জীবনের সাজা পাওয়া কয়েদিদের এই দ্বীপে এনে বন কেটে বসত গড়া শুরু করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা।

দ্বিতীয় ধারণা বিষ মাখানো তীরের বিষয়টি কিন্তু সর্বৈবভাবে ভ্রান্ত। এটা সত্য যে বাইরের মানুষ যখনই গভীর জঙ্গলে এঁদের পরম্পরাগত ভাবে বিচরণ ক্ষেত্রের

আশপাশে চুপিসাড়ে গাছটাছ কাটতে বা শুয়োর বা হরিণ শিকার করতে ঢুকেছেন অথবা এঁদের যাতায়াতের পথে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা খাঁড়ি এলাকায় মাছ ধরার জন্যে প্রবেশ করেছেন, তখনই অনুপ্রবেশকারি বাইরের মানুষকে এঁরা বাধা দিয়েছেন নিজের মতো করে তীর ছুঁড়ে। অনেকেই এঁদের স্বভাব হিংস্র, এমনকি নরখাদক বলেও মনে করেছেন।

প্রথম ধারণাটির এখনো খুব একটা হেরফের হয়েছে এমনটি বলা যায় না।

দ্বিতীয় ধারণায় অবশ্য সামান্য পরিবর্তনের আঁচ পাওয়া যায়।

ইদানীং আন্দামানে বেড়াতে যাওয়ার সুবাদে, বিশেষ করে ১৯৯৭ সালের পর থেকে যখন জারোয়া আদিবাসীদের বেশকিছু নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের শতাব্দী প্রাচীন বৈরিতার ভাবমূর্তি সরিয়ে তীর-ধনুক জঙ্গলের আস্তানায় রেখে, বাইরের মানুষের সামনে বেরিয়ে আসা শুরু করেন তখন থেকে এঁদের নিয়ে পুরানো ধারণার বদল হওয়া শুরু হয়েছে।

পর্যটকদের অনেকের মধ্যেই এখন জারোয়াদের চাক্ষুষ করার উৎসাহ দেখা যায়। পর্যটনের সুযোগে যদি 'আন্দামান ট্রাঙ্করোডে' জারোয়া নারী-পুরুষদের বাইরের মানুষের দেওয়া জামা কাপড় পরে সারা শরীরে অনভ্যাসের ছোঁয়া নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখতে পাওয়া যায় তা হলেও কেউ আর ভয় পান না। বরঞ্চ দেশের এই অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী চাক্ষুষ করার আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ আবার অভাবি ভেবে টুকরো টাকরা খাবার এঁদের হাতে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

এঁদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকায় বেশির ভাগ মানুষই এঁদের অভাবি, অভুক্ত ভেবে অনুকম্পা দেখান। বাস্তবে যদিও জঙ্গল ও সমুদ্র থেকে এঁরা বেঁচে থাকার যে রসদ সংগ্রহ করেন তাতে প্রাচুর্যের কোন খামতি নেই।

যাঁরা সামান্য খোঁজখবর রাখেন তাঁদের অনেকেই আবার এঁদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান মন্তব্যও করেন।

সাধারণ মানুষের কৌতূহল আর চিন্তার বাইরেও বহু বছর আগে থেকেই ভারত সরকার এবং আন্দামানের প্রশাসন এঁদের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে নৃতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মাঝেমাঝে আলোচনায় বসেছেন।

এঁদের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে গিয়ে বারবার উঠে এসেছে এঁদের স্বল্প জনসংখ্যার সমস্যা, সেই সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জনসংখ্যাকে প্রাথমিক ভাবে স্থিতিশীলতা দিয়ে এঁদের জনসংখ্যা কীভাবে বাড়ানো যায় তা অনুসন্ধানের চেষ্টা। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি নিকোবর দ্বীপের 'সম্পেন' আদিবাসী ছাড়া আন্দামানের যে চারটি অতি অল্পসংখ্যার জনজাতি আছেন তাঁদের মধ্যে বর্তমানে পোর্টব্লেয়ার থেকে ১২৮ কিঃমিঃ

উত্তরপূর্বে স্ট্রেট আইল্যান্ডের অধিবাসী গ্রেটআন্দামানীজদের বর্তমান জনসংখ্যা ৫৯ যা নাকি ১৯৬১ সালে মাত্র ১৯ ছিল।

পোর্টব্লেয়ার থেকে ১২২ কিঃমিঃ দূরে লিটল আন্দামানের অধিবাসী ওঙ্গীদের জনসংখ্যাও বেশ কয়েক দশক ধরে ৯০ থেকে ১০০ মধ্যে ঘোরা ফেরা করে। পোর্টব্লেয়ার থেকে ৩৬৭ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর সেন্টিনাল দ্বীপে বাস করেন সেন্টিনালীজ আদিবাসী। এঁদের সঙ্গে কোনরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আজো গড়ে না ওঠায় এঁদের সঠিক জনসংখ্যা জানার উপায় নেই। তবে মাঝেমাঝে এই দ্বীপটিতে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশে যাওয়া হয়, সেই সময় দূর থেকে সমুদ্রতটে এঁদের দেখে বা এঁদের থাকার অস্থায়ী ছাউনিগুলির সংখ্যার ভিত্তিতে মনে করা হয় ১০০ জনের মতো হবে।

অন্য যে জনজাতি নিয়ে এখন দিল্লি থেকে আন্দামান প্রশাসনের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক এবং বিভিন্ন সমাজকর্মী সংগঠন চিন্তিত সেই জারোয়া, যাঁরা নিজেদের 'অঙ' বলে পরিচয় দেন, তাঁদের সংখ্যা ৩৭৫ জন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে আন্দামানের এই স্বল্পসংখ্যক জনগোষ্ঠীগুলি ভারত সরকারের ঘোষিত 'বিশেষভাবে সংবেদনশীল জনজাতি' (Particularly Vulnerable Tribes) গোষ্ঠীর অন্যতম।

বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল জনজাতি কারা?

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৩% মানুষ আদিবাসী। এঁদের সব গোষ্ঠীর আর্থসামাজিক পরিস্থিতি একরকম নয়। বহুদিন থেকেই নৃতাত্ত্বিকরা ভারতের আদিবাসীদের এই ভিন্নতা তুলে ধরে উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এঁদের সবাইকে এক ছাঁচে না ফেলে আর্থসামাজিক ভিন্নতার মান অনুযায়ী আলাদা আলাদা শ্রেণীভুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

ভারতের আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে এমন অনেক জনজাতি আছেন যাঁরা পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। আজ থেকে ৫৬ বছর আগে ১৯৬০-৬১ সালে ধেবর কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান—উন্নয়নের মাপকাঠিতে আদিবাসীদের মধ্যে এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যাঁদের মধ্যে উন্নয়নের লেশমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। পরে ১৯৭৫ সালে এই কমিশন এবং অন্য অনেক সমীক্ষার ভিত্তিতে আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী করা হয় 'Primitive Tribe'z HC nëhátvi' ব্যবহার বহু বিতর্কের সৃষ্টি করায় শেষ পর্যন্ত ২০০৬ সালে ভারত সরকার এই শ্রেণীর আদিবাসীদের 'বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল আদিবাসী গোষ্ঠী' (Particularly Vulnerable Tribal Group;

[PVTG])fkju ভুক্ত করেন। এঁদের সংবেদনশীলতার মাপকাঠিতে রয়েছে ১) এঁরা চাষবাস করেন না, মূলত শিকার করে আর জঙ্গলের ফলমূল জোগাড় করে জীবন ধারণ করেন। ২) এঁদের জনসংখ্যা অত্যন্ত অল্প, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কার্যত শূন্য, এঁরা ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠী, ৩) অন্য সমাজের মানুষ থেকে দূরে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাপন করতে পছন্দ করেন। ৪) এঁদের ভাষা লিপিহীন ৫) সাক্ষরতা নেই বলছে চলে।

ভারতবর্ষে মোট ৭৫টি আদিবাসী এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। এঁদের মধ্যেও আবার জীবনযাত্রার মানে সবার মধ্যে সব ক'টি বিশেষত্ব পাওয়া যায় না। একমাত্র আন্দামানের পাঁচটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সবক'টি বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় আছে।

আবার আন্দামানের বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল আদিবাসীদের মধ্যে সংবেদনশীলতার নিরিখে অন্যদের তুলনায় জারোয়াদের পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে সংকটাপন্ন।

সেন্টিনেলীজদের মতো এঁরা এখন আর বাইরের মানুষের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা থাকতে পারছেন না। যদিও সেই ১৮৫৮ সালে যখন ব্রিটিশ শাসকরা এই দ্বীপে পা রাখেন তখন থেকেই বাইরের মানুষের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এঁরা দক্ষিণ আন্দামান আর মধ্য আন্দামানে পশ্চিমতট ঘেঁসা গভীর জঙ্গলে প্রায় শতাধিক বছর ধরে অন্য মানুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে গভীর জঙ্গলে পরম্পরাগত ভাবে জীবনযাপন করে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে এঁদের জন্যে দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামানের পশ্চিমতট ধরে ১০০০ বর্গ কিঃমিঃ জঙ্গল সংরক্ষিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্তমানে এঁরাই একমাত্র জনজাতি যাঁরা শতাধিক বছরের বৈরিতা ছেড়ে একদশকের কিছু বেশি সময় ধরে জঙ্গলের বাইরে থাকা বৃহত্তর সমাজের মানুষের সংস্পর্শে আসা শুরু করেছেন। বস্তুত এঁদের বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল পরিস্থিতির মোড়ে অবস্থান করছে।

সংস্পর্শের ফল:—

সংস্পর্শে আসার যেমন সুফল থাকে ঠিক সেই রকম ক্ষেত্র বিশেষে কুফলও থাকার সম্ভাবনা কম থাকে না। আন্দামানের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে সংস্পর্শের তাৎক্ষণিক কুফল বিশেষজ্ঞদের অজানা নয়। ১৮৫৮ সালে আন্দামানীজদের সংখ্যা ৩৫০০-এর মতো ছিল বলে জানা যায়—১৮৬৩-তে এঁরা বাইরের মানুষের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ব্রিটিশ জমানা থেকেই অস্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন প্রকারের মারাত্মক রোগে এঁদের সংখ্যা অতিদ্রুত হ্রাস পেতে থাকে যার উল্লেখ আগেই করেছি।

ওঙ্গীদেরও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৮৭ সালে প্রথম ব্রিটিশদের দিকে বন্ধুত্বের সংকেতের মাধ্যমে বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়। পোর্টব্লেয়ার থেকে অনেকটাই দূরে দ্বীপটি থাকায় বহু বছর বাইরের মানুষের উৎপাত খুব বেশি ছিল না। তবে যেটুকু যোগাযোগ হয়েছে তাতেই এঁদের জনসংখ্যা আন্দামানীজদের মতোই দ্রুত ক্ষয় হতে শুরু করে। ১৯০১ সালে এঁদের সংখ্যা ৫৭২ ছিল বলে জানা যায়। ১৯৬১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৯৮-এ।

বন্ধুত্বের কুফলের এই রকম নজির থাকায় বিশেষজ্ঞদের এখন প্রধান লক্ষ্য অতিসংবেদনশীল পরিস্থিতি মাথায় রেখে এঁদের জীবনযাত্রায় যথা সম্ভব কম নাকগলিয়ে এঁদের বৃহত্তর সমাজের কাছাকাছি আনার লক্ষ্যে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা। এই প্রসঙ্গে কিছু নৃতত্ত্বের তাত্ত্বিক ছাত্র আর অনেক সমাজকর্মী সংগঠন প্রশ্ন তুলতে পারেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমলে আদিবাসী উন্নয়নের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল, যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত, তার একটি বিশেষ বিষয় ছিল—আদিবাসীদের তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ হতে দাও। আমাদের কাজ হবে শুধু এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।

তাহলে আন্দামানের এই অতিসংবেদনশীল স্বল্প সংখ্যক জনজাতিগুলির রক্ষা করা এবং উন্নয়নের জন্যে এঁদের সমাজের বাইরের মানুষ কেন মাথা ঘামাবেন বা চিন্তা করবেন?

তবে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন কর্তাদের মনে রাখতে হবে আজ থেকে অর্ধশতকের বেশি সময় আগে আদিবাসী উন্নয়নের জন্যে বৃহত্তর সমাজের দায়দায়িত্বের যে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল তা মূলত ভেরিয়র এলউইন সাহেবের মধ্য ভারতে 'বাইগা' জনজাতি আর পরবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু জনজাতিদের তৎকালীন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে। এই জনজাতিগুলি কোন ভাবেই ছোট গোষ্ঠী ছিল না, আর বাইরের মানুষের চাপও এঁদের সমাজে আন্দামানের অতিসংবেদনশীল জারোয়াদের মতো কোন মতেই অভূতপূর্ব ছিল না। এ ছাড়াও বৃহৎ জনগোষ্ঠী হওয়ায় এবং বহুকাল ধরে বাইরের মানুষের সংস্পর্শে থাকায় তাঁদের পক্ষে বাইরের থেকে আসা অন্য সমাজের চাপের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য থাকে। কাজেই সেই সব বড় বড় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক বুনিয়াদের ভিত্তিতে উন্নয়নের যে রূপরেখার কথা বলা হয়েছিল, তা অতিদ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত জনজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

যাঁরা আন্দামান সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন এই দ্বীপ ভূমিতে কিভাবে প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ জীবিকার সন্ধানে এসে এই স্বল্পসংখ্যক জনজাতির ওপর মানসিক তথা জীবনযাত্রার ধরনের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন।

এইখানে খুব সংক্ষেপে এই জনগোষ্ঠীর সমাজে ঠিক কি ধরনের চাপ পড়ছে সেটা আলোচনার সুবিধার্থে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বাইরের চাপের ধরন:—

উত্তর সেন্টিনাল দ্বীপে সেন্টিনাল জনজাতি তাঁদের দ্বীপে আজো বাইরের কোন মানুষকে স্বাগত জানাননি। উল্টে তাঁদের তীর-ধনুক-বল্লম দিয়ে নিজেদের গড় রক্ষা করে পরম্পরাগত ভাবে জীবন অতিবাহিত করে আসছেন। বাইরের মানুষের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় পারতপক্ষে বাইরের চাপ সেরকম নেই বললেই চলে। তাই সংবেদনশীলতার মাপকাঠিতে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই এগিয়ে আছে বলা যায়।

ওঙ্গীদের লিটল আন্দামান দ্বীপে ১৯৬৭ সালের পরে তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কা থেকে কিছু উদ্বাস্তুদেরও স্থান হয় এখানে। বর্তমান ভারতবর্ষের বহু জায়গার মানুষ এমনকি কারনিকোবর দ্বীপের কিছু নিকোবারিদেরও এখানে বসবাস করতে দেওয়া হয়।

বাইরে থেকে মানুষ 'লিটল আন্দামান' দ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করায় ওঙ্গীদের পরম্পরাগত জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জঙ্গল আর সমুদ্র থেকে পাওয়া বেঁচে থাকার রসদে টান পড়েছে অন্যেরাও এগুলি ব্যবহার করছেন বলে। এই চাপ প্রতিনিয়ত বোধ করছে ওঙ্গীদের সমাজ। তাঁদের এই ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে কিছুটা নিস্তার দেওয়ার জন্যে আন্দামান প্রশাসন এঁদের 'ডুগংক্রীক' আর 'সাউথ বে' বলে দু'টি অঞ্চলে পুনর্বাসন দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত এঁদের খাবার আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অর্ধশতাব্দী ব্যাপী বাইরের মানুষের সান্নিধ্যে থাকায় সংবেদনশীলতার তীব্রতা খানিকটা গা সওয়া হওয়ায় এই চাপ সহ্য করায় তাঁরা কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যদিও তাঁদের পরম্পরগত সমাজব্যবস্থা বহুলাংশে অতিসংবেদনশীল থাকায় অতীব চিন্তার উদ্রেক করে।

গ্রেটআন্দামানীজদের পুনর্বাসনের পরে প্রশাসনের নানা পরিকল্পনার ফলে এঁরা অবলুপ্তির পথ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে বিয়ে করে এখন এঁদের জনসংখ্যা একটি মিশ্র জনগোষ্ঠীর রূপ নিয়েছে।

সংস্কৃতির সংবেদনশীলতার দিক থেকে এঁদের অবস্থাও বিশেষ চিন্তাজনক।

জারোয়াদের অবস্থা এই তিনটি জনজাতির পরিস্থিতি থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

তাঁদের জন্য সুরক্ষিত বনাঞ্চলের লাগোয়া গ্রামে বসবাসকারী বৃহত্তর সমাজের মানুষের সঙ্গে সদ্য গড়ে ওঠা সম্পর্কের এখন সন্ধিক্ষণ। এর আগে বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার অনীহা তাঁদের ব্যবহারে বার বার প্রকট হয়েছে।

সেই ১৮৫৮ সাল থেকে নিজেদের অতিহিংস্র গোষ্ঠী রূপে বারবার তুলে ধরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যই শুধু বজায় রাখেনি, সেন্টিনালীজদের মতোই হাজার হাজার বছর ধরে সমুদ্র আর জঙ্গলের প্রাচুর্যে ভরা রসদ বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অন্তহীন ভাবে লড়াই করে গেছেন বাইরের থেকে এঁদের এলাকার আশপাশে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এসে বসবাসকারী মানুষগুলির সঙ্গে।

বাইরের মানুষগুলিও তাঁদের জীবনধারণের উপকরণ খুঁজতে ক্রমাগত প্রবেশ করেছেন এই অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর রসদ ভাণ্ডারে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দু'দশক আগে দক্ষিণ আন্দামান থেকে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত ৩৩৩ কিঃমিঃ বিস্তৃত রাস্তা 'আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড' জারোয়াদের জন্য সংরক্ষিত জঙ্গলের গা ঘেঁসে খুলে দেওয়া হয় গাড়ি যাতায়াতের জন্যে। এই রাস্তা জারোয়াদের জীবনে বাইরের মানুষের চাপ কয়েক শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। শতাধিক বছর ধরে নিরন্তর লড়াই করে ধরে রাখা সামাজিক কাঠামো এই চাপ সহ্য করতে পারে না। আগে থেকেই প্রশাসনের কিছু সিদ্ধান্তে জারোয়াদের মধ্যে বৈরী ভাব অনেকটাই কমে এসেছিল। 'আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড' দিয়ে গাড়ি চলাচলে যখন জঙ্গলের ভিতরে এঁদের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিল তখন এঁদের অনেকেই এই ট্রাঙ্ক রোডে বেরিয়ে বাইরের মানুষের সামনাসামনি উপস্থিত হলেন।

এতদিনের ভয়ের পাঁচিল সরে যাওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফলে গ্রেট আন্দামানীজ বা ওঙ্গীদের যা হয়েছিল, সেই রকম জারোয়াদেরও মুখোমুখি হতে হল বাইরের জগৎ থেকে আসা নানারকমের রোগ জ্বালা।

চাপ কমার বদলে আরো বাড়ল।

তাই শুধু প্রশাসক আর নৃতাত্ত্বিকই নয়, সর্বস্তরের মানুষকে মিলে মিশে নিরন্তর চিন্তা করে এঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উপায় বের করতে হবে। এটাই এই পরিস্থিতিতে প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার।

যেহেতু এঁদের বর্তমানের সংকটাপন্ন অবস্থার দায় বাইরের মানুষের ওপর বর্তায় তাই নীতিগত ভাবে তাঁদেরই উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এই অতিসংবেদনশীল জনজাতির ওপর থেকে প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা চাপ কমিয়ে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার।

এই অভূতপূর্ব চাপ দেওয়া থেকে যতদিন না বাইরের মানুষ নিরস্ত হচ্ছেন ততদিন জারোয়াদের জীবন সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু তাঁদের কিছুই করার নেই, বস্তুত তাঁরা অসহায়, তাই যাঁরা মূলত এর জন্য দায়ী সেই বৃহত্তর সমাজের মানুষকেই অবলুপ্তির শংকায় ভুগতে থাকা

অতিসংবেদনশীল জারোয়াদের সঙ্গে অন্য আরো অল্প সংখ্যক মানুষের গোষ্ঠীর নিজের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে,

প্রশ্ন উঠতে পারে সেটি কি আদৌ সম্ভব? সম্ভব হ'লে কীভাবে?

আমার নৃতাত্ত্বিক জীবনের বেশ অনেকখানিই আমি আন্দামানের সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ রেখেছি।

আমি জানি এই অতিক্ষুদ্র জনজাতির পক্ষে প্রতিনিয়ত বৃহত্তর সমাজের মানুষের বেড়ে চলা চাপ কমানো অত্যন্ত কঠিন। কঠিন এই কারণে যে এই স্বল্প সংখ্যার জনজাতিকে আমরা বৃহত্তর সমাজের মানুষ কোনভাবেই সম্মানজনক স্থান দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না। এঁদের জীবনধারণের গুণগতমান বৃহত্তর সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার থেকে বহু যোজন পিছিয়ে আছে বলে মনে করি। হোক না তাঁরা খাদ্যে স্বনির্ভর, থাক না এঁদের সমাজ ব্যবস্থায় পরম্পরাগত ভাবে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম যা এঁদের হাজার হাজার বছর ধরে শিখিয়েছে কি ভাবে প্রকৃতির বুক থেকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যেটুকু রসদ প্রয়োজন শুধু সেই টুকু ব্যবহার করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে। প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা এঁদের নিরাবরণ শরীর বাইরের মানুষের কাছে এঁদের সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে। আর সেই কারণেই এঁদের আমরা নিজেদের সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বিচার করায় ব্রতী হই। সেই মাপকাঠি অনুযায়ী এঁদের জন্যে সময়ে সময়ে পরিকল্পনা করা হয়। এই সব পরিকল্পনা এই অতি স্বল্প জনসংখ্যার গোষ্ঠীতে কতখানি উপকারী হবে বা আদৌ এঁদের অতি সহজ সরল সমাজ এই পরিকল্পনার চাপ সহ্য করে উঠতে পারবে কিনা সেটি কারো ভাবার অবকাশ থাকে না।

এই ভাবে নিজেদের জীবন যাত্রার সমান স্তরে এঁদের সমাজকে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় এঁদের ওপর মানসিক এমনকি শারীরিক চাপও বৃদ্ধি করার পথ পরিষ্কার করে দেয়।

তাহলে কি কিছুই করার নেই?

নেই বলে হাল ছেড়ে বসে থাকলে তো আমরা আমাদের কৃতকর্মের ক্ষতটি শুধরাতে পারব না।

এই লক্ষ্যে আন্দামান প্রশাসন নৃতাত্ত্বিক এবং অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সময়ে সময়ে কমিটি তৈরি করেছেন এবং তাঁদের পরামর্শ চেয়েছেন।

মোটামুটি সব কমিটিই একটি বিষয়ে জোর দিয়েছেন—বৃহত্তর সমাজের মানুষরা যেন অতিসংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় দখলদারির চেষ্টা না করে এঁদের থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখেন।

একমাত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রেই বাইরের মানুষ এঁদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। এঁরা যেহেতু পরম্পরাগত ভাবে শিখে

আসা ওষুধ ব্যবহার করায় চিরকাল অভ্যস্ত তাই এঁদের শরীরের গঠনের সঙ্গে অধিক মাত্রায় আধুনিক ওষুধপত্র প্রয়োগের ভাল এবং মন্দ দিকটিও লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অনেক সমাজকর্মী সংগঠন 'আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড' পুরোপুরি বন্ধ করার জন্যে আইনের সাহায্য নিতে দেশের উচ্চতম আদালত পর্যন্ত পৌঁছে যান।

আদালতের রায়ে রাস্তাটি বন্ধ করার নির্দেশ হয়। কিন্তু সেটি খুবই অল্প সময়ের জন্য। দক্ষিণ থেকে উত্তর আন্দামান অঞ্চলে যে সব বাইরের মানুষদের এনে বসবাস করতে দেওয়া হয়েছে তাঁদের পোর্টব্লেয়ারে মূলত চিকিৎসার কারণে বা কোন আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। কার্যত এই রাস্তা আর বন্ধ করা যায়নি। খানিক বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি সচল রাখা হয়েছে।

এই রাস্তা বন্ধ হলেই যে সমস্যার সমাধান হবে আর জারোয়াদের সঙ্গে বাইরের মানুষের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা ভাবার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

'আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড'-এ ১৯৯৭ সাল থেকে জারোয়াদের কিছু নারী পুরুষ বাইরের মানুষের মুখোমুখি হচ্ছেন। এই প্রায় ১৮/১৯ বছরে উভয়পক্ষের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন যে অবিশ্বাস আর ভয়ের বাতাবরণ ছিল, তা আর দেখা যায় না।

স্বভাবতই রাস্তা বন্ধ হলেও অন্য ভাবে পরস্পরের এলাকায় আসা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর খোলা থাকে জঙ্গলের অপব্যবহার করার রাস্তা।

অন্য উপায়ের খোঁজ:—

আজ থেকে প্রায় ২৯ বছর আগে আমি আমার একটি প্রবন্ধে প্রথম এর কিছুটা হদিস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম (১৯৮৭)। আমার মনে হয়েছিল—বৃহত্তর সমাজের সিংহভাগ অংশই এই জারোয়া, ওঙ্গী, গ্রেট আন্দামানীজদের নিজেদের মতো 'সভ্য' বলে মনে করেন না। আমার মনে হয়েছিল বৃহত্তর সমাজের মানুষের এই চিন্তাধারায় বদল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেটা করার জন্যে জারোয়া অধ্যুষিত এলাকার পাশে যে সব বৃহত্তর সমাজের গ্রাম আছে সেখানের মানুষগুলির কাছে এই অতিসংবেদনশীল তথা সংকটাপন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পৃথিবীর মানব সভ্যতায় কি অসামান্য স্থান করেছে, সেটি খুব প্রাঞ্জল ভাবে ক্রমাগত বোঝানোর চেষ্টা করা। তাঁদের বোঝানো প্রয়োজন যে আপাত ভাবে যাঁদের আমরা 'অসভ্য', 'জংলী' বা এই ধরনের তকমা দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণী হিসেবে দেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, তাঁরা আসলে ভারতবর্ষের বর্ণময় সংস্কৃতিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছেন।

আন্দামানের এই অঞ্চলে এঁদের পূর্বপুরুষরা সুদূর অতীত থেকে বসবাস করছেন। এঁরাই এখানের প্রকৃত অধিবাসী। এঁদের সর্বৈব অধিকার আছে এখানে নিজের মতো করে জীবন ধারণ করার।

আমাদের অর্বাচীনের মতো ব্যবহার এঁদের সমাজে গভীর সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

নিরন্তর যুক্তিযুক্ত ভাবে প্রচার করা হলে বাইরের সবাই না হলেও কিছুসংখ্যক মানুষের মনে হয়তো কিছুটা পরিবর্তন আনা সম্ভব হলেও হতে পারে যার ফলে এঁদের প্রতি অবজ্ঞা আর অবিশ্বাসও সরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। এঁদের প্রতি এমন কোন আচরণে আমরা লিপ্ত হব না যাতে এঁদের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

জারোয়াদের পরিস্থিতি:—

আন্দামানের চারটি অতিসংবেদনশীল জনজাতির জীবন প্রবাহের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক ভাবে বাইরের জগৎ থেকে এঁদের সমাজের ওপর প্রতিনিয়ত এসে পড়া চাপের তীব্রতার তারতম্য রয়েছে। পরিস্থিতির এই তারতম্যের সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার অনীহা এখন অনেক স্তিমিত হয়েছে।

জারোয়াদের পরিস্থিতি আন্দামানীজ বা ওঙ্গীদের থেকে কিছু ভিন্ন। বিগত প্রায় দু'দশক ধরে বৃহত্তর সমাজের মানুষের সংস্পর্শে এলেও এঁরা এখনো তাঁদের চিরাচরিত ভাবে চলে আসা পদ্ধতি অনুসারে জীবনযাপন করছেন। অন্য দুটি সংকটাপন্ন জনজাতির মতো অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ারও কোন লক্ষণ এঁদের মধ্যে দেখা য়ায়নি।

বস্তুত এই অতিসংবেদনশীল সন্ধিক্ষণ থেকে এঁদের বেরিয়ে আসার পথ বাইরে থেকে এই অঞ্চলে আসা মানুষের ব্যবহারের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বৃহত্তর সমাজের মানুষগুলি যদি সংকটাপন্ন বনবাসীদের জীবন যাত্রায় অযথা বিঘ্ন না আনে, তা হলেই বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা সামাল দিয়ে বাইরের চাপ যথাসম্ভব কমানো সম্ভব হবে। তাঁরা যদি এই চাপ বোধ করে পরম্পরাগতভাবে অর্জিত সামাজিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারেন তা হলেই পাশাপাশি দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনযাত্রা আর সংস্কৃতির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রিত মেলামেশা গড়ে ওঠার মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা থাকবে।

সময়ের স্রোতে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সক্ষম হবেন। এই পরিস্থিতি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনজাতির বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি প্রবহমান থাকতে সাহায্য করবে।

Reference: Sarkar Jayanta (1987) Befriending the Jarawa: a challenging task, Human Science.36(1), 1-12